হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 3, Issue No. 2, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, June 2013

যদি এই পৃথিবীতে এমন কোন দেশ থাকে যাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিকশিত করা যেতে পারে, যদি এমন কোন স্থান থাকে...যেখানে মানুষের ভিতর ক্ষমা, দয়া, পবিত্রতা, শান্তভাব প্রভৃতি সৎগুণের বিকাশ সবচেয়ে অধিক পরিমাণ হয়েছে তবে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি সে আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতবর্ষ।

—স্বামী বিবেকানন্দ

মেদিনীপুরে কালীমূর্তির অবমাননা

রাগে ফুঁসছে এলাকার হিন্দু যুবকেরা

মেদিনীপুর জেলায় গত ১২ই মে রাত নটা নাগাদ স্থানীয় গোয়লাপাড়ার কিছু ছেলে কেরাণীতলার রাস্তার ধারে মোটর সাইকেলে বসে গল্প করছিল। হঠাৎ একটা কন্টেনার ট্রাক দ্রুত এসে

মেদিনীপুরে কালীমন্দিরে ভাঙা মূর্তি

বাইকগুলোকে ধাক্কা মারে এবং গাড়িগুলো কাছে 'পান্‌কো মটোর' দোকানে ঢুকে যায়। একটি ছেলের আঘাত লাগে। ছেলেগুলো ছুটে গিয়ে ট্রাকটি ধরে ফেলে এবং দাঁড় করায়। ড্রাইভারকে এত জোরে গাড়ি চালানোর কারণ জানতে চাইলে ড্রাইভার জবাবদিহি করতে অস্বীকার করে। রেগে গিয়ে ছেলেগুলো ট্রাকের হেড লাইটটি ভেঙে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে কাছের দিওয়ান স্পোর্টিং ক্লাবের ছেলেরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। ক্লাবের সেক্রেটারি শেখ লাল্টু ও শেখ টুলু ঘটনার কোন বিবরণ না শুনেই গোয়লাপাড়ার ছেলেগুলোকে মারতে শুরু করে। পরস্পর গোয়ালপাড়া ও দিওয়ান ক্লাবের সদস্যরা মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে। তারা পরস্পরের দিকে ইঁট ছুঁড়তে থাকে। গোলয়ালপাড়া ছেলেদের ছোঁড়া একটি ইঁট মাজারে লাগলে মুসলমানরা বলতে থাকে হিন্দুরা ইচ্ছা করে ইঁট ছুঁড়ে মাজারটি ভেঙে দিয়েছে। সেই অজুহাতে মুসলমানরা রাস্তার পাশে একটি কালী মন্দিরের কালী মা'র মূর্তি লাথি মেরে ভেঙে দেয়। এমন কি ভাঙা বিগ্রহ নিয়ে তারা খেলা শুরু করে। গোয়ালাপাড়ার ছেলেগুলো মন্দির ও কালী মা'র মূর্তি ভাঙাটা সহ্য করতে পারেনি। তারা গোয়ালাপাড়া থেকে হিন্দু যুবকদের নিয়ে এলাকায় ফিরে আসে এবং মাজার ও পাশের একটি মসজিদের প্রভূত ক্ষতি করে।

হিন্দুদের প্রতি আক্রমণের খবর প্রশাসনের কাছে পৌঁছালে প্রশাসন সালুয়া থেকে র‍্যাফ নিয়ে এসে এলাকাটি ঘিরে ফেলে এবং এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে দেয়। এলাকার সমস্ত হিন্দু মাকালীর মূর্তি ভাঙার জন্য রাগে ফুঁসছে এবং যে কোন ভাবে এই ঘটনার প্রতিশোধ নিতে তারা বদ্ধপরিকর। এলাকায় টহলরত র‍্যাফ বাহিনীর মধ্যেও হিন্দুদের প্রতি একটা নৈতিক সমর্থন আছে, তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এলাকার এম.এল.এ. মৃগেন মাইতি ও পূর্বতন কমিশনার নাজিম আহমেদ এলাকায় শান্তির জন্য আহ্বান জানিয়েছে। যদিও তাদের আবেদনের পরও এলাকার উত্তেজনা এতটুকু প্রশমিত হয়নি।

মোড়কে দেব-দেবীর ছবি

প্রতিবাদে মুখর হিন্দু সংগঠন

কাউন্সিলিং-এ নেমেছে সোসাইটি এগেইনস্ট মিসইউস অন রোভার ফিগার্সের সদস্যরা। গত ২১শে মে শুক্রবার সংস্থার প্রতিনিধিরা পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে বিভিন্ন মোড়কে দেব-দেবীর ছবি ও জাতীয় প্রতীকের ছবি বন্ধ করার জন্য আবেদন জানান। সংস্থার প্রতিনিধি আইনজীবী রতন বণিক বলেন, বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মোড়কের গায়ে দেবদেবীর ছবি, জাতীয় প্রতীকের ছবি ব্যবহার করছে একশ্রেণির মোড়ক প্রস্তুতকারী সংস্থা। দ্রব্য ব্যবহারের পর আমরা মোড়ক রাস্তায় ফেলে দিচ্ছি এবং অসতর্কতায় সেগুলো মাড়িও ফেলছি। এতে হিন্দুদের দেবী ও জাতীয় প্রতীককে অমান্য ও অপমান করা হচ্ছে। মানুষ যাতে এই সমস্ত মোড়ক ব্যবহারে সংযত হয় তারজন্য প্রচারের পাশাপাশি জনসচেতনতা ও কাউন্সিলিং-এর কাজ শুরু হয়েছে। যারা অশোক স্তম্ভ, অশোক চক্র ও হিন্দুদের দেবীর অবমাননা করছে পুলিশ যেন নিজ ক্ষমতাবলে এই অপকর্ম বন্ধ করতে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বে-আইনি মসজিদ নির্মাণ রুখল হিন্দু সংহতির কর্মীরা

সরকারি জমিতে নির্মীয়মান বে-আইনি মসজিদ

উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ পাইকপাড়া ঘাটবাহর অঞ্চলে পাইকপাড়ার কাছে একটি কালীমন্দির আছে। মন্দিরের থেকে কিছু দূরে একটি বিতর্কিত জমি আছে। যে জমিকে নিয়ে আদালতে দীর্ঘদিন ধরে কেস চলছে। ২৩শে মে এলাকার মুসলমানরা ঐ বিতর্কিত জমিতে একটা মসজিদ তৈরির চেষ্টা করে। সকাল ১১টার সময় কিছু বয়স্ক ও যুবক মুসলমান বিতর্কিত জমিতে একটা নির্মাণ করছিল, যদিও তারা জানে এই জমিটি সরকারী জমি। এর আগে ২০০৬ সালে এই জমিতেই মুসলমানেরা একটি মসজিদ তৈরির চেষ্টা করে। হিন্দুরা এর প্রতিবাদী হয়ে স্থানীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে একটা কেস দায়ের করে। ২০০৬ সালে আগস্ট মাসে হাইকোর্ট থেকে ঐ জমির উপর একটা ইনজাংশন জারি করে। কোর্টের এই রায়কে উপেক্ষা ও ভোটলোভী রাজনৈতিক দলকে প্রভাবিত করে ঐ জমিতে মসজিদ নির্মাণ করতে চাইছে। যখন নির্মাণ কাজ চলছে তখন স্থানীয় হিন্দুরা এর কারণ জানতে চায়। মুসলমানরা বলে যে এটা সামান্য একটা পরিষ্কার করা হচ্ছে। কিন্তু হিন্দুদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং তারা মুসলমানদের কাজ বন্ধ করতে বলে। কিন্তু এরপরেও মুসলমানরা কাজ চালালে হিন্দুরা স্থানীয় প্রশাসনকে বিষয়টি জানায়। যখন হিন্দুরা পুলিশকে জানায় অবিলম্বে এই বেআইনি নির্মাণ বন্ধ না করলে এলাকায় সাম্প্রদায়িক সমস্যা সৃষ্টি হবে। এরপর পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং মুসলমানরা যে নির্মাণ করছে তার বৈধ কাগজপত্র দেখতে চায়। কিন্তু মুসলমানরা কোন কাগজপত্র দেখাতে না পারলে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয়।

এই নির্মাণ কাজ যখন চলছিল তখন ত্রিশজন হিন্দু সংহতি-র ছেলে গিয়ে রুখে দাঁড়ায়। মুসলমানদের সংখ্যা শতাধিক ছিল তবু সংহতির সাহসী যুবকেরা এই বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের সাহায্যে তা বন্ধ করতে সক্ষম হয়। যদি হিন্দু সংহতির ছেলেরা এই বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়াতো তাহলে ঐ বিতর্কিত জমিতে মুসলমানরা মসজিদ নির্মাণ করে ফেলত। আর এই মসজিদ হত আগামীদিনে হিন্দু নিধনের আশ্রয়স্থল।

দশ হাজার টাকা ভাতার দাবিতে ইমামদের আন্দোলন

পঞ্চায়েত ভোট যত এগিয়ে আসছে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা ভোট ব্যাঙ্কের দৌলতে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে নিজেদের ফায়দা লোটার কাজে নেমে পড়েছে। কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার ইমামদের জন্য মাসিক আড়াই হাজার টাকা ভাতা ঘোষণা করেছিল। গত ৩০শে মে উত্তরবঙ্গে এক ইমামদের অনুষ্ঠানে তারা সরকারের কাছ থেকে দশ হাজার টাকা করে মাসিক ভাতার দাবি করেছে।

গত ২৯শে মে বুধবার, উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি ব্লকের বিলাসপুর হাই মাদ্রাসায় এক সম্মেলনে মিলিত হলেন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ইমামরা। তাদের দাবি, দশ হাজার টাকা করে তাদের মাসিক বেতন দেওয়া হোক। এদিন সকাল দশটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত এই সম্মেলন চলে। প্রায় হাজার খানেক ইমাম-মৌলবী ও অন্যান্যরা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিল। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রিয় কমিটির মুখ্য সচিব মুর্শিদাবাদ থেকে আগত আব্দুল আজাদ। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে তারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাদের দাবির কথা জানিয়েছে। বর্তমানে রাজ্য সরকার তাদের আড়াই হাজার টাকা করে ভাতা দিলেও দশ হাজার টাকা বেতন বৃদ্ধির জন্য তারা তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

ভ্রম সংশোধন

'স্বদেশ সংহতি সংবাদ'-এ গত মে মাসের সংখ্যায় Vol. No. 2, Issue No. 13 লেখা হয়েছিল। পরিবর্তে Vol. No. 3, Issue No. 1 লেখা হবে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

আমাদের কথা

পঞ্চায়েত ভোটের ঘণ্টা বাজতেই অতি সক্রিয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে দীর্ঘ চাপান-উতরের পর অবশেষে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করলো নির্বাচন কমিশন। পঞ্চায়েত ভোটের দিন ঘোষণা হতেই পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নড়েচড়ে বসেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় জানে যে তাদের ভোট পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভাগ্য গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। তারা এও জানে ভোট ভিখারী রাজনৈতিক দলগুলো সংখ্যালঘু ভোট নিজের পক্ষে টানতে ঢালাও প্রতিশ্রুতি দেবে ও তাদের অনৈতক কাজগুলো দেখেও দেখবে না। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে তারা কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। বলাগড়ের দ্বারপাড়ায় কবরস্থান নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যেই সরকার থেকে সাড়ে দশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে, ইমামরা সরকারের কাছে মাসিক দশ হাজার টাকা ভাতা দাবি করেছে, বনগাঁয় বিতর্কিত জমিতে মসজিদ নির্মাণ করতে সচেষ্ট হয়েছে। এছাড়া সংখ্যালঘুদের চরম হিন্দু বিদ্বেষী মনোভাব দেখতে পাওয়া গেছে এ ক'দিনে। মালদার কালিয়াচকে পূজার শোভাযাত্রার উপর হামলা, মেদনীপুর মন্দিরে ঢুকে দেবী মূর্তি ভাঙা, বাগনানের কাঁটাপুকুরে হিন্দুদের বৈধ জমিতে বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে মারধোর করা, বিভিন্ন জেলায় অবৈধ অগ্নেয়াস্ত্র কারখানা তৈরি—এরকম আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আসলে সংখ্যালঘুরা তাদের আখেরটা ভালোই বোঝে। সংখ্যাগুরু হিন্দুদের মাথায় পা রেখে তারা তাদের স্বার্থটা ঠিক পূরণ করে নিচ্ছে। আর একদিন পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর অংশ বিভক্ত করে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত করে তারা তাদের স্বপ্নপূরণ করে নেবে। মুসলমানরা অশিক্ষিত, পশ্চাৎপদ ও রাজনৈতিক বিবেচনাহীন বলে যে সব বুদ্ধিজীবীরা তাদের বুদ্ধির কৃশতা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। মুসলমানেরা রাজনৈতিক ও সম্প্রদায়গত ব্যাপারে কতখানি সচেতন তা উপরের উদাহরণ গুলিই প্রমাণ করে।

এ প্রসঙ্গে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী অবিভক্ত বঙ্গের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেই সময়ে বঙ্গে ৫৪ শতাংশ মুসলমান ও ৪৬ শতাংশ হিন্দু বাস করত। তাই দেখা যায় স্বাধীনতার পূর্ববর্তী অবিভক্ত বঙ্গের অন্তবর্তীকালীন সরকারের তিন জন মুখ্যমন্ত্রীই মুসলমান সম্প্রদায়ের। এটা তাদের রাজনৈতিক সচেতনতারই পরিচয়। সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায় যেখানে বাস করে সেখানকার প্রধান শাসক কখনই এক জন অ-মুসলমান হতে পারে না। এই প্রকৃত সত্যটা আমরা সেদিন বুঝতে পারিনি, আজও বুঝতে অপারগ। তাই নির্লজ্জের মতো গদি বাঁচাতে মুসলিম তোষণ করে চলেছি। কিন্তু অবস্থাটা যদি পরিবর্তন হয় অর্থাৎ সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের সমান হয়ে যায় বা বৃদ্ধি পায় তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব, প্রদীপ ভট্টাচার্য, রাহুল সিনহারা তাদের গদি বাঁচাতে পারবে তো? ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী নজরুল ইসলাম রাজ্যের জন্য মুসলমান মুখ্যমন্ত্রীর দাবি করে রেখেছে। ১৯৪০ সালে জিন্নার পাকিস্তান দাবির মতোই এ দাবি আজ হাস্যকর মনে হতে পারে। কিন্তু যেমন করে মাত্র সাত বছরের মধ্যে পাকিস্তান তৈরি করে জিন্না প্রমাণ করেছিল যে, তার দাবি ফাঁকা আওয়াজ ছিল না। তেমনি, এমন ভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর পদে একজন মুসলমানই বসবে। আর এ হলে বাঙালি হিন্দুকে আর একবার মাথা নত করে নিজ বাসভূমি থেকে পলায়ন করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের আকাশে আজ তাই ঘোর কালো দুর্যোগের মেঘ। সমূহ বিপর্যয়ের অশনি সংকেত। এই অবস্থায় শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া বাঙালি হিন্দুর আর বাঁচার আশা নেই। হিন্দু সংহতি এই সত্য উপলব্ধি করে গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধের পাঁচিল গড়ে তুলছে। লড়াইয়ে কোথাও পরাজয়, আবার কোথাও জয় হচ্ছে। কিন্তু সংহতির কর্মীরা সকলের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে সচেষ্ট—যে ঐক্যবদ্ধ হিন্দু প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে আগামী দিন আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে গেলে চলবে না, মাথা নত করে নেওয়ার চেয়ে বড় পরাজয় আর কিছু নেই। লড়াইয়ের ময়দানে পরাজয় হলেও শক্তির বিনাশ ঘটে না। এই উপলব্ধি একদিন শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ হিন্দু সমাজ গড়ে তুলবে।

এখন ভাববার সময় এসেছে পথ হিসাবে আমরা কোনটা বেছে নেব---মুসলমানদের অত্যাচারের কাছে মাথা নত করে মূষিকের জীবন না শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলে জনজাগরণ ও হিন্দু বিপ্লব সাধন। উত্তরটা আপামর হিন্দুর উপরই ছেড়ে দেওয়া যাক।

পুড়ল লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তি

অশান্ত হুগলীর বলাগড়

হুগলী জেলার বলাগড় থানার অন্তর্গত দ্বারপাড়া গ্রাম। এই গ্রামে বহু বছরের পুরানো ৪৮ শতক দেবোত্তর সম্পত্তি যেখানে একটি পুরানো লক্ষ্মী-নারায়ণের বিগ্রহ আছে এবং নিয়মিত পূজাও হয়। এর ঠিক পাশে আছে মুসলিমদের কবরস্থান এবং এটি বহুদিন ধরে বিতর্কিত। স্থানীয় সূত্রে খবর যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কবরস্থান উন্নয়নের জন্য সাড়ে দশ লক্ষ টাকা এসেছে পঞ্চায়েত তহবিলে। এলাকার হিন্দুদের বক্তব্য তারা হঠাৎ করে শুনতে পায় যে কবরস্থানটি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হবে, তাতে তাদের কোনো ক্ষোভ ছিল না, কিন্তু ৪৮ শতক দেবোত্তর সম্পত্তির বেশ কিছু অংশ মুসলিমরা জোর করে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে নিতে চাইছে কবরস্থানের সম্পত্তি দাবী করে। তখন এলাকার হিন্দুরা প্রশাসন ও ঐ স্থানের মুসলিমদের কাছে দাবী করে তাদের ৪৮ শতক দেবোত্তর সম্পত্তি তারা বুঝিয়ে দিক এবং জমিটি সঠিকভাবে পরিমাপ করা হোক তারপর তারা পাঁচিল দিয়ে ঘিরে নিক। তখন এলাকার মুসলিমরা হিন্দুদের উপর চড়াও হয়। ঐ পাঁচিল নির্মাণ কার্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপে কিছুদিনের মত স্থগিত থাকে।

গত ১৯শে মে রাতে মুসলিমরা ঐ দেবোত্তর সম্পত্তির উপর তাণ্ডব চালায় ও এলাকার হিন্দুদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তিকে পুড়িয়ে ফেলে এবং হিন্দু দেব-দেবী ও হিন্দুদেরকে নিয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে ও হিন্দুদেরকে এলাকায় থাকতে দেওয়া হবে না বলে হুমকিও দেওয়া হয়। ২০শে মে সকালবেলা হিন্দুরা পোড়া লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তিটি উল্লেখ্য সম্পত্তির পাশে খুঁজে পায়। ধর্মীয় আঘাতের প্রতিবাদে হিন্দুরা সঠিক বিচারের আশায় কিছুক্ষণের জন্য ঐ স্থান সংলগ্ন রাস্তাটি অবরোধ করে। তখন মুসলিমদের সাথে এই সমস্ত ব্যাপারে কিছু বচসা শুরু হয় তারপর মুসলিমরা হিন্দুদের উপর চড়াও হয়। তারা দলবেঁধে হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পরে, ঘটনা একটা খণ্ডযুদ্ধের আকার ধারণ করে, ঘটনায় বেশ কিছু হিন্দু ছেলে আহত হয়, এদের মধ্যে সমীর সিংহ গুরুতরভাবে জখম হয়, তাকে চুঁচুড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনা মুসলিমদের মধ্যে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে ও আশপাশ থেকে ওই এলাকায় জড়ো হতে শুরু করে। ঘটনাস্থল একটা ভয়াবহ আকার ধারণ করে তখন বলাগড় থানা থেকে প্রচুর পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয় অবশেষে বি.ডি.ও.-র হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনায় পুলিশ ছয় জন হিন্দুকে গ্রেফতার করে, এদের মধ্যে সুভাষ খাঁ, সঞ্জীব পোদ্দার, সমীর দে এছাড়াও তিন জন হিন্দু যুবক।

এলাকার একটা বড় অংশের হিন্দুরা মনে করছে, কবরস্থান উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ পাইয়ে দেওয়া ও ঘটনার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের মুসলিমদের সহযোগিতা এসব-ই আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে মুসলিমদের একটি বড় অংশের ভোটের আশায়।

বিদ্যুৎ চুরিকে কেন্দ্র করে উত্তাল ডায়মন্ডহারবারের মালঞ্চ গ্রাম

ডায়মন্ডহারবারের মালঞ্চ গ্রামে গত ১৭ই মে ঝড়ে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে রাস্তায় পড়লে কয়েকজন হিন্দু বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়। যদিও কোন প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। এলাকার হিন্দুদের আর যাতে কোন বিপদ না হয় তারজন্য বিদ্যুতের লাইন বন্ধ করে দেয়। এই গ্রামে মাত্র চারমাস আগে বিদ্যুৎ আসে। কিন্তু আশপাশের বেশ কয়েকটি মুসলিম গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ না পৌঁছানোয় তারা মালঞ্চ গ্রামকে শত্রুর চোখে দেখে। শুধু তাই নয় মালঞ্চ ও অন্যান্য হিন্দু গ্রাম থেকে বিদ্যুৎ চুরি করে এইসব মুসলমান গ্রামগুলো। বিদ্যুতের লাইন বন্ধ করাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র গণ্ডগোল ছড়িয়ে পড়ে।

হিন্দুরা বিদ্যুতের লাইন বন্ধ করে দিলে হুকিং করা মুসলমান গ্রামগুলো নিষ্প্রদীপ হয়ে যায়। পাশের মুসলিম অধ্যুষিত কমলপুরের পুরপুটপাড়া থেকে মুসলমানরা দলবেঁধে মালঞ্চ গ্রামে ছুটে আসে এবং কেন বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেওয়া হল তা নিয়ে হম্বিতম্বি করতে থাকে। কথা কাটাকাটি শেষে হাতাহাতিতে পরিণত হয়। নেত্রা পঞ্চায়েতের প্রধান ওদুদ গাজি স্বভাবতই মুসলমানদের পক্ষে যায় এবং ঘটনার মীমাংসা করতে গিয়ে বলেন, হিন্দু গ্রামগুলোর উচিৎ প্রতিবেশী মুসলিম গ্রামগুলোকে সাহায্য করা। কিন্তু হিন্দুরা ওদুদ গাজির কথা মানতে রাজি হয়নি এবং বিদ্যুৎ চুরির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়। যে কোন মূল্যে গ্রামের বিদ্যুৎ চুরির ঘটনা তারা রুখবে বলে জানায়। এর পরবর্তী সময়ে মুসলমানরা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায়। কিছু মুসলমানদের বক্তব্য তারা হিন্দুদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে চায়। কিন্তু কিছু মুসলমান হিন্দু বিদ্বেষী মনোভাব বজায় রাখে। তবে এই ব্যাপারটা সাময়িকভাবে হলেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখতে সাহায্য করে।

কিন্তু ২০শে মে মুসলমানরা বিদ্যুৎ চুরি করার জন্য ধারালো অস্ত্র নিয়ে হিন্দুদের আক্রমণ করে। কিন্তু এলাকার হিন্দুরা সামনাসামনি এই ঘটনার প্রতিবাদ না করে এলাকার তৃণমূল নেতা জয়ন্ত ঘোষ, আমন সাঁপুই, রজ্জাক শেখ ও এদুদ গাজিকে বিষয়টি জানায়। কিন্তু জয়ন্ত ঘোষ ছাড়া আর কেউ বিষয়টিকে আমল দিয়ে চায়নি। জয়ন্তবাবু এলাকার হিন্দুবাসীদের জানায় যে তারা যেন কোন প্রতি আক্রমণে না যায়। হুকিং বা বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করতে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবিক বিদ্যুৎ চুরি রুখতে ঘটনাস্থলে কোন পুলিশ আসেনি। তাই এলাকার সমস্ত হিন্দু গ্রামগুলো ঠিক করেছে যে প্রশাসনের উপর ভরসা না রেখে তারা নিজেরাই প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলবে এবং এলাকায় এলাকায় পাহারা দেবে। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী এলাকায় একটা চাপা উত্তেজনা আছে এবং নিজেদের গ্রাম বাঁচানোর দায়িত্ব হিন্দুরা নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে।

ইসলামিক বর্বরতা দেখল সারা বিশ্ব

প্রকাশ্য দিবালোকে যুবতীকে ধর্ষণ

ইউ-টিউবের মাধ্যমে সারা বিশ্ব দেখলো ইসলামিক বর্বরতার এক নারকীয়া দৃশ্য। ইসলামিক রাষ্ট্র ইজিপ্ট (মিশর)-এ প্রকাশ্য দিবালোকে জনবহুল রাস্তায় এক খ্রিষ্টান যুবতীকে নগ্ন করে ধর্ষণ করলো মুসলিম যুবকেরা।

চিত্রে স্পষ্ট দেখা গেছে মুসলিম যুবকেরা চারদিক থেকে ঘিরে যুবতীটির পরনের কাপড় খুলে নিচ্ছে। মেয়েটির মা আপ্রাণ চেষ্টা করছে মুসলিম যুবকদের লালসা থেকে মেয়েকে বাঁচাতে। আশেপাশে তখন অনেক লোকের ভিড়। পথ চলতি সাধারণ মানুষের কাছে তাকে সাহায্যের প্রার্থনাও করতে দেখা যায়। কিন্তু ইসলাম ধর্মমত অনুযায়ী বিধর্মী নারীকে ধর্ষণ ও লুণ্ঠন করা তো পবিত্র কাজ। তাই পথচলতি ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষরা মেয়েটি ও তার মা-কে কোন সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। উল্টে তারা এই দৃশ্যকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছে। অসহায়ভাবে ইসলামিক বর্বতার শিকার হতে হয়েছে তাদের। ইসলাম শান্তির ধর্ম বলেন যারা তাদের কাছে এই দৃশ্য কি শান্তির নমুনা?

এই ঘটনা সারা বিশ্বে প্রবল নিন্দার ঝড় তুলেছে। সর্বত্র মুসলমানদের এই বর্বরতাকে ধিক্কার জানানো হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে কোন ইসলামিক রাষ্ট্র এর প্রতিবাদে এগিয়ে আসেনি। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে ইসলাম সমর্থকদের প্রকৃত মনোভাব কি? ইজিপ্ট খ্রিস্টান যুবতীকে ধর্ষণ ও ও তার উপর নির্যাতন সারা বিশ্বের কাছে এই সত্য তুলে ধরেছে যে বিশ্বের যে কোন ইসলামিক রাষ্ট্রে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জীবন ও সম্পত্তির কোন নিরাপত্তা নেই।

মৌলবীর দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ করায় জেলে গেল হিন্দু যুবক

গত ২৬শে মে রবিবার আমতা থানার কুশবেড়িয়া অঞ্চলে তেগেজিয়া গ্রামে তারামা আশ্রমের এক সন্ন্যাসী মারা যান। ঐ আশ্রমের পাশে অবস্থিত একটি ক্লাবের ছেলেরা সৎকার্য করার জন্য সন্ন্যাসীর মরদেহ রাস্তার পাশে নিয়ে আসে। তখন ঐ রাস্তা দিয়ে কয়েকজন মৌলবী টাটা সুমো করে যাচ্ছিল। রাস্তার উপর ছেলেদের জটলা দেখে মৌলবীরা তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। কথা কাটাকাটির মধ্যে মৌলবীরা গালাগাল করলে লাল্টু হাইত নামে একটি ছেলে এক মৌলবীর উপর চড়াও হয়ে তাকে মারধোর করে। তার দাড়ি ধরে টান দিলে দাড়ি ছিঁড়ে যায়। এরপর মৌলবীরা আমতা থানায় ডাইরি করলে পুলিশ এসে লাল্টু হাইতকে গ্রেপ্তার করে। অথচ মৌলবীদের দুর্ব্যবহারের কোন প্রতিকার হয় না। লাল্টু এখন উলুবেড়িয়া জেলে আছে।

বিবেকানন্দের মূল্যায়ন

তপন কুমার ঘোষ

হাতি ঘোড়া গেল তল, ব্যাঙ বলে কত জল! এই প্রবাদটার সঙ্গে সবাই পরিচিত। কত বড় বড় লেখক, বুদ্ধিজীবি, সাধু, সন্ন্যাসী, দেশী ও বিদেশী, স্বামীজীর মূল্যায়ন করেছেন। তার পরেও আমি মূল্যায়ণ করতে বসেছি শুনলে সকলেরই বোধহয় ওই প্রবাদটাই মনে পড়বে। সাগরে হাতি ঘোড়া তলিয়ে গেল। তারপর ব্যাঙ বলছে—কত জল মাপব। আমিও তাই স্বামী বিবেকানন্দ সাগরের জল মাপতে নেমেছি। তবে কি জানেন। হাতি ঘোড়ারা সাঁতার জানলেও জলে তাদের বাস নয়। কিন্তু ব্যাঙের তো জলেই বাস তার ক্ষুদ্র জীবনের অনেকটা সময়। তাই বোধহয় সে ওইরকম দুঃসাহস দেখায়। ঠিক তেমনি আমি বোদ্ধাও নই, বিবেকানন্দ বিশেষজ্ঞও নই। কিন্তু আমার তো বিবেকানন্দ সাগরেই বাস অনেকটা। তাই সেই সাগরের অসীম পরিধি দেখে ভয় পাই না।

আমার এই মূল্যায়ন অবশ্যই বোদ্ধাদের জন্য নয়, সাধারণ মানুষের জন্য। বোদ্ধারা বিবেকানন্দের বাণী, কাজ ও অবদানকে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেন। আর সাধারণ মানুষরা বিবেকানন্দ থেকে অনুপ্রাণিত হওয়ার চেষ্টা করেন ও শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করেন। বিবেকানন্দের সেই প্রেরণা ও শিক্ষা যদি ভুল দিকে পারিচালিত হয়, তাহলে দেশের বড় ক্ষতি। তাই আমার এই কলম ধরা।

যে কোন সাধারণ মানুষ, ছাত্র, যুবককে যদি প্রশ্ন করা হয়, স্বামী বিবেকানন্দের প্রধান প্রেরণা ও শিক্ষা কী? ১০০ জনের মধ্যে ৯৯ জনের কাছে উত্তর পাওয়া যাবে—নররূপে নারায়ণ সেবা, জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। অর্থাৎ, মানুষের সেবা করাই স্বামীজীর প্রধান শিক্ষা। তারপর যদি আবার প্রশ্ন করা হয় যে স্বামীজীর জীবনে তাঁর নিজের হাতে সেবা করার কতগুলো ঘটনা বলতে পারবেন? ছোটবেলায় মাকে না বলে জানলা দিয়ে সাধুকে নতুন কাপড় দেওয়া, একেবারে শেষ জীবনে সাঁওতাল শ্রমিক কেষ্টাদেরকে নিজের হাতে খাওয়ানো—এছাড়া খুব বেশি ঘটনা খুঁজে পাওয়া যাবে কি? বোধহয় না। যে গুরুকে তিনি অবতার মনে করতেন, যাঁর সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, 'সেই মূর্তিপূজক ধুলো থেকে তাঁর মত হাজার বিবেকানন্দ তৈরি করতে পারেন', সেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কতটা সেবা স্বামীজী নিজের হাতে করেছেন? কাশীপুর মঠ ঠাকুরের অন্তিম সময়। গলায় ক্যান্সার। তাঁর যুবক-কিশোর শিষ্যরা প্রাণ ঢেলে ভগবান জ্ঞানে ঠাকুরের সেবা করছেন। একদিন নরেন্দ্রনাথ অনুভব করতে পারলেন যে গুরুভাইদের মনে সংশয়ের সামান্য মেঘ জমেছে। সংশয়টা এই—নরেন তো সেভাবে ঠাকুরের সেবা করছে না! তাহলে কি নরেন ঠাকুরকে সাক্ষাৎ অবতার বলে মনের ভিতর থেকে বিশ্বাস করে না? নরেন তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারলেন এই সংশয়ের কথা। তিনি সব গুরুভাইকে ঠাকুরের শয্যার পাশে ডেকে নিয়ে তাদেরকে বললেন, আমি তোদের মত ঠাকুরের সেভাবে সেবা করিনা বলে তোদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে যে আমি ঠাকুরকে সাক্ষাৎ অবতার মনে করি কিনা? আমি ঠাকুরকে কি চোখে দেখি এই দ্যাখ—বলে নরেন ঠাকুরের কাশিতে বেরনো কফ, থুতু ও গলার ঘায়ের পুঁজ-রক্ত যে মাটির মালসায় ঠাকুর ফেলতেন—সেই মালসাটা দুহাতে তুলে ধরে নিজের মুখে লাগিয়ে খেয়ে নিলেন। এই দৃশ্য দেখে নরেনের গুরুভাইরা স্তম্ভিত। এই হল বিবেকানন্দের গুরুসেবার নমুনা। একে সেবা বলবেন, না বীরত্ব বলবেন, না হঠকারিতা বলবেন? আমি বলব—স্বামীজী যাই করেছেন সবকিছুতেই ক্ষাত্রতেজের প্রকাশ। মনে পড়ে না মহাভারতের সেই গল্পগুলো। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরুর ঠিক আগে সব রথী মহারথীরা গিয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি গুরুজনদের প্রণাম করছে। কিন্তু অর্জুন যাচ্ছে না। সবাই ভাবছে অর্জুনের খুব অহংকার হয়েছে। হঠাৎ কয়েকটা তীর এসে পড়ল ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্যদের পায়ের কাছে। অর্জুনের প্রণাম। শরশয্যায় পিতামহ ভীষ্ম। বললেন, তৃষ্ণা পেয়েছে—জল দাও। দুর্যোধন তাড়াতাড়ি করে সোনার গ্লাসে করে জল নিয়ে এল। ভীষ্ম অর্জুনের দিকে তাকালেন। অর্জুন তার গাণ্ডীবে তীর যোজনা করে মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। পাতাল (ভূগর্ভ) থেকে জল ফোয়ারার মত উঠে ভীষ্মের মুখে পড়ল। তৃষ্ণা নিবারণ হল। ক্ষত্রিয়ের জলদান। ক্ষত্রিয় সেবা করতে পারে না। ক্ষত্রিয়ের জন্ম সেবা করার জন্য হয়নি। যুদ্ধ করার জন্য তার জন্ম হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন আপাদমস্তক ক্ষত্রিয়—চরিত্রে ও প্রকৃতিতে। তাই তাঁকে বলা হত সন্ন্যাসী যোদ্ধা। পাঠক বিবেকানন্দের সারা জীবনের ঘটনাগুলো মিলিয়ে দেখে নিন।

ছোট্ট বিলের ধ্যান করা—সেবা আছে? বাবার সেরেস্তায় সব জাতের হুঁকোয় টান দিয়ে জাত পরীক্ষা করা—সেবা? প্রতিবেশীর গাছে দোল খেয়ে ভূত প্রেত দেখার চেষ্টা করা—সেবা? ছোট্ট সাথী ঘোড়ায় টানা ট্রামের নীচে চাপা পড়ছিল। ছুটে গিয়ে তাকে বাঁচানো—এতে সেবার পরিচয় বেশি পাওয়া যায়, না বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় বেশি পাওয়া যায়? গঙ্গার ঘাটে গিয়ে দারোয়ানের পাহারা এড়িয়ে জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে অনুমতি আদায় করে বন্ধুদেরকে জাহাজ ঘুরে দেখানো—সেবা না বীরত্ব? আমেরিকা যাত্রার সময় জাহাজে এক পাদ্রীকে ঘাড় ধরে সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার হুমকি দেওয়া—সেবা? যিনি নিজে সারা জীবনে সেবা করলেন না, তাঁর প্রধান বাণী হবে—সেবা কর? তা হতে পারে না।

স্বামীজী 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা', 'জীবে প্রেম করে যেই জন...', এগুলো তো বলেছেন। কিন্তু আর কিছু বলেন নি? 'মনে রাখিও তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত'—এটা সেবা করার আহ্বান নয়, যুদ্ধের আহ্বান, দেশমাতৃকার জন্য আত্মোৎসর্গ করার আহ্বান, যে আহ্বান অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা বুঝেছিলেন, আজকের গাড়ি বাড়িওয়ালা 'ঠাকুর-স্বামীজী ভক্তরা' বোঝেননি। সঠিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এই বাংলায় অগ্নিযুগের উদ্গাতাই স্বামীজী ও তাঁর অগ্নিশিষ্যা নিবেদিতা। স্বামীজী ভারতবাণীটা আর একবার ভাল করে পড়ুন তো। 'হে ভারত, ভুলিও না দরিদ্র ভারতবাসী , মূর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী তোমার ভাই।' 'এই পরাণুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই ঘৃণিত দাসসুলভ দুর্বলতা—এইমাত্র সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা বসুন্ধরা লাভ করিবে?' 'তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল ভারতবাসী আমার ভাই আমার প্রাণ আমার রক্ত'। এগুলো কি বজ্রনির্ঘোষ নয়? এর মধ্যে সেবার আহ্বান খুঁজে পান? এক প্রচণ্ড স্বাভিমানে উদ্দীপ্ত হওয়ার আহ্বান শুনতে পান না? 'ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আমার শৈশবের শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী'। এরমধ্যে এক গভীর দেশপ্রেমের আহ্বান শুনতে পান না? আমেরিকা যাত্রা থেকে ফিরে মাদ্রাজের জাহাজঘাটে সমুদ্রতটে বালিতে গড়াগড়ি খেয়ে উঠে বললেন, 'চারবছর পাশ্চাত্যের ভোগভূমিতে থেকে শরীর মনে কত কলুষ জমা হয়েছে। এই মাটি মেখে কলুষমুক্ত হলাম।' আরও বললেন, 'আমি আগেও দেশকে ভালবাসতাম। কিন্তু চারবছর বিদেশযাত্রার পর এখন আমার কাছে ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা পবিত্র মনে হচ্ছে'। এরমধ্যে এক তীব্র দেশপ্রেম দেখতে পাচ্ছেন না? শ্রীরামচন্দ্রের সেই বাণী--- 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'-র প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন না? ১৮৯৯ সালে কলকাতায় প্লেগের মহামারীর সময় সেবা করার জন্য দরকার হলে বেলুড়ের জমিটাও বিক্রি করে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ১৯০১ সালে বেলুড় মঠে দুর্গাপূজার আগে শিষ্যকে বলছেন, ''রঘুনন্দন বলেছেন, 'নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্দমম্'—মার ইচ্ছা হয় তো তাও করব।'' অর্থাৎ মাটিতে পশুবলির রক্তে যে কাদা হবে— সেই কাদা দিয়ে মা দুর্গার নবমীর পূজা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। (স্বামীজীর বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ২২৬) এটার দিকে নজর পড়ে না?

আমেরিকা থেকে ফেরার পর ১৮৯৭ সালের ১লা মে বরানগর মঠে স্বামীজী প্রতিষ্ঠা করলেন রামকৃষ্ণ মিশন। ১৮৯৮ সালে বেলুড়ে জমি পাওয়া গেল। তারপর ১৮৯৯ সালে তিনি আলমোড়ার কাছে মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রম স্থাপন করলেন। উদ্দেশ্য—শুধুমাত্র অদ্বৈত বেদান্ত চর্চা ও সাধনা। সেবা নয়। ১৮৯৭ সালে পরিব্রাজনে বেরিয়ে গুরুভাই অখণ্ডানন্দ যখন মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে দুর্ভিক্ষে মানুষের দুর্দশা দেখে তার প্রাণ কেঁদে উঠল। বেলডাঙ্গার কাছে সারগাছিতেই আটকে গিয়ে সেবা করতে লাগলেন। তাঁর আর তীর্থযাত্রায় যাওয়া হল না। আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে বেশ সংগঠিতভাবে সেবা কাজ শুরু করলেন। সংবাদ পেয়ে বিবেকানন্দ গুরুভাইকে চিঠি লিখলেন প্রচণ্ড উৎসাহ দিয়ে। কিন্তু নিজে একবারও সেই আশ্রম পরিদর্শন করতে যাননি। অথচ শুধুমাত্র ঠাকুরের গৃহীশিষ্য নাগ মহাশয়ের বাড়ি দেখার জন্য জীবনের প্রায় অন্তিম সময়ে ১৯০১ সালে খুব অসুস্থ শরীরেও পূর্ববঙ্গ ও আসাম ভ্রমণ করেছেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম সেবাকেন্দ্র দর্শন করতে যাননি।

তাহলে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত মানুষরা সেবাকাজ ও সেবা ধর্মকেই তাঁর প্রধান ভাব বলে কেন মনে করেন? এর দুটি উত্তর। এই কাজটা সহজ বলে, বিপদ কম বলে, রিস্ক নিতে হয় না বলে, বলিদান দিতে বা বলি হতে হয় না বলে। তাই স্বামীজীর তৈরি সংস্থার কর্মকর্তা, সন্ন্যাসী ও ভক্তরা এই সহজ কাজটা বেছে নিয়েছেন। কিন্তু সবাই কি শুধু সহজ বলেই এটা করে? না। বাকিরা করে 'লোক না পোক' বলে। সাধারণ মানুষের নিজস্ব চিন্তাভাবনার ক্ষমতা কম। তাই বড় বড় বাড়ি, বড় বড় গাড়ি, বড় বড় লোক (ডাক্তার, মোক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, লেখক ইত্যাদি), গেরুয়া পরা সন্ন্যাসী, তাঁরা যখন বলেন যে সেবাটাই স্বামীজীর প্রধান ভাব, প্রধান কাজ, তখন সাধারণ মানুষরা ভাবেন ওটাই ঠিক। তাদের একথা ভাবার ক্ষমতা নেই যে, স্বামীজী কেন বলেছেন—সারা দেশে রজোগুণের বন্যা বইয়ে দে। সেবা করতে কি রজোগুণ লাগে? স্বামীজী কেন বলেছেন—গীতা পড়ার আগে ফুটবল খেলে আয়। স্বামীজী কেন বলেছেন—সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায়, কোন কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা যায় না। কেন বলেছেন—সম্প্রসারণই জীবন, সংকোচনই মৃত্যু। স্বামীজী কেন বলেছেন—সমস্ত শাস্ত্র ঘাঁটিয়া আমি যদি কোনো একটিমাত্র কথা পাইয়া থাকি, তা হইল 'অভীঃ', অর্থাৎ ভয়হীনতা। সুতরাং সাহসকে তিনি সমস্ত শাস্ত্র উপদেশের সারবস্তু বলে মনে করছেন। এর কোনটাই কি সেবাকাজে অনুপ্রাণিত করে?

তাহলে স্বামী বিবেকানন্দ কি সেবা করতে বলেন নি? বলেছেন। তাঁর অনেক ভাবের মধ্যে সেবাও একটা ভাব। কিন্তু প্রধান ভাব নয়, মূল ভাব নয়। স্বামীজীর মূল ভাব কী—সে বিষয়ে ঐক্যমত হওয়া কঠিন। আমি তো জোর দিয়ে বলতে পারি, স্বামীজী নরনারায়ণ সেবার উপর যতটা জোর দিয়েছেন, তার থেকে অনেক বেশি জোর দিয়েছেন বেদান্ত ও অদ্বৈত দর্শনের প্রচারে। বেলুড় মঠ ছাড়া তাঁর নিজের হাতে তৈরি ও অতি প্রিয় মঠ ছিল হিমালয়ের কোলে মায়াবতীর অদ্বৈত মঠ, যেখানে কোন সেবাপ্রকল্প তিনি শুরু করেননি। তাই, অমার মতে তাঁর নিজের ভাব অদ্বৈত। কিন্তু ভাব অদ্বৈত হলে কি হবে, তাঁর প্রকৃতির ধাতুটা তো ছিল ক্ষত্রিয়। মাথা নীচু করতে পারতেন না। নিজে অপমান সহ্য করা তো দূরের কথা, তাঁর দেশবাসী অপমান হজম

শেষাংশ ৪ পাতায়

৩য় পাতার শেষাংশ

বিবেকানন্দের মূল্যায়ন

করে নিচ্ছে—এটাও তাঁর কাছে অসহ্য ছিল। তাই তাঁর বাক্য— 'এই ঘৃণিত দাসসুলভ মানসিকতা—এই মাত্র সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা বসুন্ধরা লাভ করিবে?" অর্থাৎ তিনি তীব্রভাবে চাইতেন যে তাঁর দেশবাসী যেন বীরভোগ্যা বসুন্ধরা লাভ করে। অর্থাৎ তাঁর দেশবাসী যেন বীর হয়। তাঁর প্রিয় চরিত্র ছিল কঠোপনিষদের নচিকেতা। বালক নচিকেতাকে স্বয়ং যমও তার জেদ ছাড়াতে পারেননি, এর নাম বীরত্ব। স্বামীজীর নামের আগে যে 'বীর সন্ন্যাসী' বিশেষণ লাগানো হয়েছে—সেটাই সঠিক শব্দ। স্বামীজী ছিলেন বীর, সাহসী, তেজস্বী, রাজা। তাঁর নামের আগে 'সেবক' শব্দ লাগালে তা বড়ই বেমানান হবে। 'তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুতা'—এসব বর্ণনা স্বামীজীর নামে করলে হাসি পাবে। তিনি ছিলেন বীর সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী রাজা।

স্বামীজীর নিজস্ব ভাব ছিল অদ্বৈত। কিন্তু দেশের জন্য অবদান ছিল অন্য। তা ছিল—কয়েকশ বছরের পরাধীন এই জাতির স্বাভিমান ও আত্মবিশ্বাসের স্তরটাকে অনেকটা উঁচুতে তুলে ধরা। কোন এক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় এই কাজ দুঃসাধ্য ছিল না, অসাধ্য ছিল। সেই অসাধ্যকে স্বামীজী সাধ্য বা সম্ভব করেছেন। এতবড় দেশ এতবড় জাতির ক্ষেত্রে এ কাজ যে কত বড়, কত কঠিন এবং কত প্রয়োজনীয়—তা অনুধাবন যদি কেউ করতে পারে—তা-ই অনেক। সেইজন্য স্বামীজী নিজের মূল্যায়ন নিজেই করেছেন দুরকমভাবে। তিনি বলেছেন—আর একজন বিবেকানন্দ থাকলে বুঝতে পারত আমি কী করে গেলাম। আর এক স্থানে তিনি বলেছেন—জাতির জন্য আগামী দেড় হাজার বছরের খোরাক দিয়ে গেলাম। হিমালয়ের উচ্চতা মাপা যায়, সমুদ্রের গভীরতা মাপা যায়। তার থেকে অনেক বেশি কঠিন ভারতের জাতীয় জীবনে বিবেকানন্দের অবদানের গভীরতা ও ব্যাপ্তি পরিমাপ করা। তার সেই অবদান শুধু সেবাভাবের জাগরণ নয়। তার থেকে অনেক বেশি কিছু।

অনেকের আপত্তি হবে জেনেও আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, ৭০০ বছরের পরাধীন একটা জাতি, যা বহুদিন ধরে বিদেশীর দাসত্ব করছে—সে জাতি সম্ভবতঃ স্বামীজীর ওই প্রচণ্ড বীরত্বের উত্তরাধিকার ধারণে অসমর্থ ছিল। তারমধ্যে তাঁরই তৈরি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরাও ব্যতিক্রম নন। তাঁদের মধ্যে অনন্য কর্মী ছিলেন, যোগী ছিলেন, সাধক ছিলেন, সেবক ছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর শৌর্য্য, বীর্য, ক্ষাত্রতেজের উত্তরাধিকারী কেউ ছিলেন না। তাই তো তাঁর প্রিয় শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার স্থান হল না তাঁর মৃত্যুর পর মিশনে। বৃটিশ শাসকের রক্তচক্ষু থেকে রক্ষা পাবার জন্য মিশন কর্তৃপক্ষ, অর্থাৎ সন্ন্যাসীরা নিবেদিতাকে বিদায় করে দিলেন। সংস্থাকে বাঁচানোর জন্যই করলেন—তা ঠিক। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে বৃটিশের রক্তচক্ষুকে তাঁরা ভয় পেতেন। সন্ন্যাসী, তাতে আবার বিবেকানন্দর গুরুভাই—তাঁরাও ভয় পান। তাহলে সন্ন্যাসী হওয়া কেন? যারা বিরজা হোম করে নিজের পৈতে পুড়িয়ে গোত্র ত্যাগ করে নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করে সন্ন্যাসী হন, তাঁরাও ভয় পান? দেখা যাচ্ছে—পান। তাই সেদিন বৃটিশের রক্তচক্ষুকে ভয় পেয়ে সন্ন্যাসীরা নিবেদিতাকে তাড়ালেন। আর এদিন সিপিএমের রক্তচক্ষুকে ভয় পেয়ে সন্ন্যাসীরা রামকৃষ্ণ মিশনকে অহিন্দু সংখ্যালঘু ঘোষণা করে দিলেন। ইতিহাসের কি পরিহাস। তাই বোধহয় প্রবাদ আছে, আহার নিদ্রা ভয়, যত বাড়াবে ততই হয়। ভয় পেতে শুরু করলে তার শেষ নেই। রামকৃষ্ণ মিশন দেখিয়ে দিল যে ভয়ে বাপের নাম পর্যন্ত পাল্টে ফেলা যায়। যাক, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন হিন্দু থেকে গেছে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট ওই মামলায় এই রায় দিয়েছিলেন সিপিএম সরকারের দায়ের করা মামলায় সিপিএম-এর পক্ষে রায় দিয়ে। তাই রাস্তার চ্যাংড়া ছেলেরা যদি স্লোগান দেয়— "রামকৃষ্ণ মিশনকে হিন্দু করল কে, সি.পি.এম আবার কে", তাহলে সেই স্লোগানকে তথ্যগতভাবে (factually) ভুল বলা যাবে না।

তাই আমার মতে রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পার্থিব ও বৈষয়িক উত্তরাধিকার পেয়েছে। আর ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর ভাব ও বীরত্বের উত্তরাধিকার পেয়েছেন। অর্থাৎ স্বামীজীর মূল ভাব বেলুড় মঠের ওই ধূপধুনোর ধোঁয়ায় পাওয়া যাবে না। নিঃসন্দেহে রামকৃষ্ণ মিশন বহু সেবা কাজ করেছে। তার অবদানও কিছু কম নয়। কিন্তু তা দিয়ে এই বিশাল সমাজের আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মান ও স্বাভিমানের স্তরটাকে তোলা যায় না। অথচ সেটাই ছিল স্বামীজীর প্রধান কাজ, সেবা নয়। সেই কাজ ভগিনী নিবেদিতা করেছেন। এ জাতির আত্মার জাগরণে, স্বাভিমান বোধের প্রতিষ্ঠায় নিবেদিতার অবদানের সঠিক মূল্যায়ন আজও হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তিতে, জগদীশচন্দ্র বোসের বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বোস, আনন্দ কুমারস্বামী প্রভৃতি শিল্পীদেরকে ভারতীয় শিল্পে আকৃষ্ট করায়, সর্বোপরি সশস্ত্র সংগ্রামের বিপ্লবীদেরকে অনুপ্রাণিত ও সহযোগিতা করায় ও শ্রীঅরবিন্দকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ও সাংবাদিকতায় সহযোগিতা করায় ভগিনী নিবেদিতার অবদান। তার ফলেই জাতীয় জাগরণ।

তাই স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের সার্ধ শতবর্ষ উদ্‌যাপনে তাঁর সঠিক মূল্যায়ন এটাই হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

লাভ জেহাদের শিকার ঃ হারিয়ে গেল পায়েল মন্ডল

মালদা জেলার কালিয়াচক থানার অন্তর্গত সুজাপুর গ্রামের পায়েল মণ্ডলকে অপহরণ করলো লাভ জেহাদ শিকারীরা। পায়েলের বাবা সুজয় কুমার মণ্ডল ও মা অঞ্জনা মণ্ডল প্রশাসনের দ্বারে মাথা ঠুঁকেও পায়েলকে উদ্ধার করতে পারেনি। তারা মালদার এস.পি., মানবাধিকার কমিশন, সংবাদ মাধ্যম, এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরেও বিষয়টি জানিয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন ফল হয়নি।

গতবছর ২০১২ সালের ২৭শে ডিসেম্বর পায়েল অপহৃত হয়। কিন্তু পায়েলকে অপহরণের ছক অনেকদিন আগে থেকে তৈরি করেছিল লাভ জেহাদী ওসমান গাজি। এ ব্যাপারে তার প্রধান সহযোগী বাবা আসরাফুল শেখ (মিন্টু), যিনি সুজাপুর গ্রামের কংগ্রেসের সদস্য।

একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী পায়েলের জন্য তার বাবা-মা একজন ভালো শিক্ষকের সন্ধান করছিল। সেই সময় পায়েলের বন্ধু নাজিয়া খাতুন পাশের বসত বাড়ি অঞ্চলের জিয়াউল মাস্টারের কাছে পায়েলকে নিয়ে যায়। গরীব পরিবারটি অল্প পয়সায় মাস্টার পেয়ে সেখানেই পায়েলের পড়ার ব্যবস্থা করে। জিয়াউল মাস্টারের কোচিং ক্লাস আসলে হিন্দু মেয়েদের জন্য পাতা এক ফাঁদ। সেই ফাঁদে পায়েল ধীরে ধীরে জড়িয়ে যেতে থাকে। নাজিয়া একদিন নরম মনের পায়েলকে নিজের বাড়ি নিয়ে যায় এবং সেখানে ওসমান গাজির সঙ্গে পায়েলের আলাপ করিয়ে দেয়। ওসমান পায়েলকে প্রেম নিবেদন করলে পায়েল তা প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু ওসমান তার পিছু ছাড়ে না। প্রায়ই পায়েলের কোচিং-এ গিয়ে তাকে বিরক্ত করতো এবং পায়েল তার কথায় রাজি না হলে তাকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিত। পায়েল বুঝতে পারে সে নাজিয়া-ওসমানদের ফাঁদে পড়ে গেছে। সে বাবা-মা'কে সব কথা জানায় এবং কোচিং-এ যাওয়া বন্ধ করে দেয়। এমন কি বাবা-মা'কে তার বিয়ে দিয়ে দেওয়ার কথাও বলে। এরপর থেকে ওসমানদের অত্যাচার আরও বেড়ে যায়। পায়েলের যাতায়াতের পথে ওসমান তার বন্ধুদের নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো ও কটূক্তি করতো। তাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকিও একাধিকবার ওসমান গাজি দিয়েছে। শেষে একসময় পায়েলের বাড়ি থেকে বের হওয়াও বন্ধ হয়ে যায়। পায়েলের দাদাকে প্রাণে মারার হুমকিও ওসমান গাজি দেয়। পায়েল তারা বাবাকে বারবার থানায় রিপোর্ট করতে বলে কিন্তু মুসলমানদের হুমকির ভয়ে সুজয়বাবু থানায় যেতে সাহস করেনি। নিরুপায় হয়ে সুজয়বাবু মেয়েকে তার মাসির বাড়ি মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দেয়।

পায়েলকে তার মাসির বাড়ি পাঠিয়েও মুসলমানদের গ্রাস থেকে তাকে রক্ষা করা যায়নি। ২৭শে ডিসেম্বর ২০১২তে ওসমান গাজি ও তার দলবল মাসির বাড়ির সংলগ্ন অঞ্চল থেকে পায়েলকে অপহরণ করে। তখন পায়েলের বয়স ছিল সতেরো বছর তিন মাস। তারপর থেকে সুজয়বাবু ও অঞ্জনা দেবী থানা-পুলিশ ও প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে দীর্ঘ ছয় মাস ধরে ঘুরছেন কিন্তু এখনও পর্যন্ত পায়েলকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কোথাও কোথাও প্রশাসনের অসহযোগিতা সুজয়বাবুকে অবাক করেছে। মালদার এস.পি.-র বক্তব্য ১৮ বছর হলে আপনার মেয়ে বাড়ি ফিরে আসবে। তার আগে কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এমন কি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকেও বারবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে সুজয়বাবুকে। গত ছয় মাসে তারা আশ্বাস দেওয়া ছাড়া আর কিছু করেনি।

এমন অবস্থায় গত সপ্তাহে সুজয়বাবু ও অঞ্জনা দেবী হিন্দু সংহতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এসে সংহতি সভাপতি তপন ঘোষের সঙ্গে দেখা করেন। শ্রীঘোষ তৎক্ষণাৎ বিষয়টি ইন্টারনেটের মাধ্যমে সর্বত্র জানিয়ে দেন। প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করে দ্রুত পায়েলকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হচ্ছে। পায়েলকে কত সময়ের মধ্যে উদ্ধার করা সম্ভব হবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না, কিন্তু তপন ঘোষের তৎপরতায় প্রশাসনও যে নড়েচড়ে বসেছে, তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে।

জমি নিয়ে বিরোধের জের

মুসলমানদের মারে আহত গৃহবধূ

উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি থানার মহেশপুর অঞ্চলে ভূটারু বর্মন নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে ঐ অঞ্চলের কমল সিং নামক এক ব্যক্তির একটি জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল। এই নিয়ে ১৬ই মে উভয় পক্ষের তুমুল বচসা হয়। এরপর সকাল ৯টার সময় ভটারু বর্মন রাসাখোওয়া মার্কেটে বাজার করতে গেলে স্থানীয় তৃণমূলের এক মুসলিম নেতার নেতৃত্বে কিছু দুষ্কৃতি ভটারু বর্মণের বাড়িতে চড়াও হয়। তারা ভটারুবাবুর স্ত্রী ও বড় বৌমাকে প্রচণ্ড মারধোর করে। লোহার রড দিয়ে মেরে তার স্ত্রীর মাথা ফাটিয়ে দেয় ও বড় বৌমার পায়ে হাঁসুয়া দিয়ে কোপ মারে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাদের ফেলে দুষ্কৃতিরা চলে যায়। খবর পেয়ে ভটারু বর্মন এসে দেখে তার স্ত্রী ও বড় বৌমা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে, ঘরের জিনিসপত্র সব ভেঙেচুরে পড়ে আছে। শুধু তাই নয় বেশ কিছু জিনিসপত্র, টাকাপয়সা দুষ্কৃতিরা লুঠ করে নিয়ে গেছে। হাসপাতালে স্ত্রী ও বৌমাকে নিয়ে গেলে সেখানে বলে এটা পুলিশ কেস। সেই মতো ভটারুবাবু করণদিঘি থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি এফ.আই.আর. দায়ের করে। কিন্তু থানার অফিসার কাদের উল্টে ভটারু বর্মনকে শাসায়।

এরপর তিন চারদিন কেটে গেলেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি, উপরন্তু এদের করা অভিযোগও ফেরত দিচ্ছে না। এর কারণ হল অভিযুক্ত সাহাফজ, (পিতা নৈমুদ্দীন) নামক দালালের হয়ে থানার অফিসার কাদের কাজকর্ম করে। তাই তাদের দিয়ে একটি ভুয়ো কেস ভটারুর বিরুদ্ধে করে তাকে গ্রেপ্তারের ভয় দেখায়। অসহায় গরিব পরিবারটি পুলিশের কাছে সুবিচার না পেয়ে শেষে এস.পি-র দ্বারস্থ হয়। এখন দেখার প্রশাসনের উচ্চমহলে ভটারু বর্মন কতখানি সুবিচার পায়।

কালিকাপুরে জোর করে শোভাযাত্রা বন্ধ করল মুসলমানেরা

মালদা জেলার মুসলিম অধ্যুষিত কালিয়াচকে হিন্দুদের স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত। এই অঞ্চলে মুসলমানদের অত্যাচার দিন দিন বেড়েই চলেছে। কিছুদিন আগে এই অঞ্চলের পায়েল মন্ডলকে অপহরণ করে মুসলিম দুষ্কৃতিরা। এবার তারা হিন্দুদের ধর্মীয় অধিকারকে সঙ্কুচিত করতে উঠে পড়ে লেগেছে।

গত ১৫ই মে কালিয়াচক থানার কালিকাপুর গ্রামে শিবপূজা উপলক্ষে দিনের বেলায় একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। হিন্দু প্রধান এই গ্রামটিতে মাত্র চার-পাঁচ ঘর মুসলমানের বাস। সকাল ১০টার সময় যখন এই শোভাযাত্রা মুসলিমদের ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তখন মুসলমানরা ঐ শোভাযাত্রায় বাধার সৃষ্টি করে। মুসলমানদের বক্তব্য, তাদের ঘরের সামনে দিয়ে হিন্দুদের কোন শোভাযাত্রা যেতে পারবে না। হিন্দুরা মুসলমানদের কথা মানতে রাজি হয়নি। তারা ঐ পথ দিয়ে জোর করে শোভাযাত্রা নিয়ে যেতে গেলে মুসলমানদের সঙ্গে তাদের প্রথমে বচসা বাঁধে, পরে তা ঠেলাঠেলিতে পরিণত হয়। এমন সময় এই শোভাযাত্রার মুখ্য ব্যক্তি করুণা মণ্ডলকে কাসেম খান ও তার ছেলে ভোলা খান প্রচণ্ড মারধোর করে। দারুণভাবে আহত করুণাবাবুকে কালিয়াচক হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। তিনদিন তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। এই ঘটনায় হিন্দুরা ভয় পেয়ে যায় এবং শোভাযাত্রাটি বন্ধ করে দেয়। হিন্দু সংহতির কর্মী মুকুন্দ কোলে গ্রামবাসীদের কাছে প্রশ্ন করে, তারা রুখে দাঁড়ালো না কেন, একথা জানতে চাইলে উত্তরে গ্রামবাসীরা বলে প্রতিবাদ করার মতো সাহস তাদের নেই। কারণ কালিকাপুর গ্রামটি হিন্দু প্রধান হলেও তার আশেপাশের গ্রামগুলো মুসলিম অধ্যুষিত। এর আগে মুসলিম দুষ্কৃতিদের দ্বারা বহুবার অত্যাচারিত হিন্দুরা পুলিশকে জানিয়ে কোন ফল পায়নি। রাজনৈতিক দলগুলো ও প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে মুসলমানদের কাছে নতিস্বীকার করেছে। তাই অত্যাচার ও ধর্মীয় অপমানটা কালিকাপুরের হিন্দুরা নীরবে হজম করতে বাধ্য হয়েছে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ধর্মস্থান আক্রান্ত

কিশোরগঞ্জের মন্দিরে হামলা চালিয়ে ৭টি মূর্তি ভাঙল দুর্বৃত্তরা

মুসলিম দুর্বৃত্তের আক্রমণে মন্দিরের ভাঙা মূর্তি

বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুরে গত ২৯শে মে বুধবার ভোরে শত বছরের ঐতিহ্যবাহী একটি মন্দিরে দুর্বৃত্তরা হামাল চালিয়ে ৭টি দেবদেবীর মূর্তি ভাঙচুর ও মূর্তির গায়ের কাপড় আগুনে পুড়িয়ে দেয়। এতে সংখ্যালঘু হিন্দুরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তারা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে জড়িতদের শাস্তির দাবী জানিয়েছে। খবর পেয়ে জেলাশাসক মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, পুলিশ সুপার আনোয়ার হোসেন খান ও জেলা পূজা কমিটির সভাপতি আইনজীবী ভূপেন্দ্র ভৌমিক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

জানা গেছে, উপজেলার আড়াইবাড়িয়া ইউনিয়নের পূর্ব দীপেশ্বর গ্রামের শত বছরের প্রাচীন শ্রী শ্রী কুলেশ্বরী বাড়ি দেবালয়ে কৃষ্ণমন্দির ও কালীমন্দিরে সংখ্যালঘু হিন্দুরা দীর্ঘ দিন ধরে পূজা করে আসছিল। বুধবার সকালে পুরোহিত রতন কুমার চৌধুরী অন্যদিনের মতো পূজা দিতে গিয়ে কৃষ্ণ মন্দিরের সাতটি মূর্তির মাথা ও হাত ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। পুরোহিত জানায়, দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে সে এখানে পূজা অর্চনা করলেও এর আগে এমন ঘটনা ঘটেনি। মন্দির কমিটির সভাপতি পরেশ চন্দ্র মোদক ও সম্পাদক দীপক চন্দ্র মোদক বলেন, মন্দিরে পাহারাদার নিয়োজিত না থাকায় দুর্বৃত্তরা রাতের আঁধারে হামলা চালিয়ে কৃষ্ণ মন্দিরের রাধা, কৃষ্ণ, গৌর, নিতাই, অদ্বৈত গোঁসাই ও নিত্যানন্দের ৭টি মূর্তির মাথা ও হাত ভাঙচুর করে। এ সময় তারা মূর্তির গায়ের কাপড় আগুনে পুড়িয়ে দেয়। পুলিশ সুপার ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত চিহ্নিত করে তাদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তি দেওয়ার কথা বলেন। যদিও এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

ভোলায় মন্দিরে হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর

ভোলার লালমোহন উপজেলায় মন্দিরে হামলা চালিয়ে আটটি প্রতিমা ভাঙল মুসলিম দুর্বৃত্তরা। এদের আক্রমণে মন্দিরের সেবাইত সহ তিনজন বাংলাদেশী আহত হয়েছে। ৩১শে মে শুক্রবার দুপুর সাড়ে বারোটার সময় অন্নদাপ্রসাদ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। আটক ব্যক্তিরা হলেন জসিমউদ্দীন, মোবারক হোসেন ও রিয়াজ হোসেন।

পুলিশ ও এলাকাবাসীর বিবরণ অনুযায়ী, একটি গরু অন্নদাপ্রসাদ গ্রামের নিরঞ্জন চন্দ্র দাসের খেতের ট্যাঁড়স খায়। এ নিয়ে গরুর মালিক আলি আহমেদ ব্যাপারীর সঙ্গে নিরঞ্জনের স্ত্রী ঝর্ণা দেবীর কথা কাটাকাটি হয়। এই সময় আলী আহমেদ ঝর্ণা দেবীকে মারধোর করে। তখন পাশের মন্দিরের সেবাইত কিরণচন্দ্র এগিয়ে এসে আলীকে বাধা দেবার চেষ্টা করে। এর জেরে আলীর নেতৃত্বে ১৫-২০ জন মুসলমান মন্দিরে হামলা চালায়। মন্দিরের আটটি প্রতিমা তারা ভাঙচুর করে। সেবাইত কিরণচন্দ্র তার মা বিরঙ্গনী বৈষ্ণব ও ভাইয়ের স্ত্রী ববিতা দাসকে মারধোর করায় তারা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে।

জয়নগরে বালিকার শ্লীলতাহানির অপচেষ্টা রুখল সংহতি কর্মীরা

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর থানার অন্তর্গত দুর্গাপুর মিস্ত্রিপাড়ার বাসিন্দা বাদল দাসের কন্যা ১৪ বছরের বকুল দাস সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ টিউশান পড়তে যাচ্ছিল। পথে কতকগুলো মুসলমান ছেলে তাকে উত্যক্ত করতে থাকে। বকুল প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও মুসলমান ছেলেগুলো তার পিছু নেয়। এদের মধ্যে একজন সামসুদ মোল্লা (পিতা জালাল মোল্লা) বকুলের ব্যাগের মধ্যে একটি মোবাইল ফোন ঢুকিয়ে দেয়। তারপর সামসুদ ও অন্যান্য মুসলমান ছেলেরা মোবাইল চাওয়ার নাম করে বকুলের গায়ে হাত দেয়। সামসুদ মোল্লা বকুলকে কুপ্রস্তাব দিলে সে মুসলমান ছেলেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে চিৎকার করে সাহায্য চায়। তার চিৎকারে মুহূর্তে এলাকার লোক জড়ো হয়ে যায়, যার মধ্যে কয়েকজন হিন্দু সংহতির কর্মীও ছিল। সংহতি কর্মীরা ব্যাপারটা যখন বকুলের থেকে শুনে মুসলমান ছেলেদেরকে তার কাছে ক্ষমা চাইতে বলে। কিন্তু তারা ক্ষমা চাইতে ইতঃস্তত করলে সংহতি কর্মীরা তাদের বেশ কয়েকটা চড়-থাপ্পড় মারে। শেষে ছেলেগুলো মৌখিকভাবে ক্ষমা চেয়ে নিলে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে মুসলমানরা তাদের এলাকা থেকে দলবল নিয়ে এসে চড়াও হয়, কিন্তু দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরে সংহতি কর্মীদের ভয়ে তারা কোনরকম দাপট দেখাতে পারেনি। সংহতি কর্মীরা এলাকায় সচেষ্ট থেকে মুসলমানদের সমস্ত রকম অসামাজিক কাজে বাধা দিচ্ছে। এলাকার মানুষও সংহতি কর্মীদের উপর আস্থা রাখতে শুরু করেছে।

বারুইপুরে জমি দখলকে কেন্দ্র করে বিরোধ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরের ১ নং পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শিখরবালি গ্রামে গত ২১শে এপ্রিল এক ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানদের ব্যাপক মারপিট হয়। খেলা চলাকালীন একটি মুসলিম ছেলে হিন্দু ছেলেদের হুমকি দিতে তাকে সতর্ক করা হয়। এই নিয়ে মুসলমান ছেলেরা প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করলে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়।

ঘটনার সূত্রপাত, যে মাঠটিতে খেলা হচ্ছিল সেটি মুসলমান গ্রামের ঠিক উল্টো দিকে, যেটি একটি খাস জমি ছিল বৈদ্যনাথ মণ্ডল নামক এক চাষীর যার বাড়ি প্রামাণিক পাড়া-সর্দার পাড়ায়। কিন্তু ২০১১ সালে এই খাসজমিটি বৈদ্যনাথ মণ্ডলের কাছ থেকে রফিক মণ্ডল ও রশিদ মণ্ডল নামে দুই ভাই কেড়ে নেয় এবং জমিটিকে একটি খেলার মাঠ করে দেয়। কিন্তু গ্রামের সাধারণ হিন্দুরা মনে করে যে জমিটিকে খেলার মাঠ করার পিছনে মুসলমানদের চক্রান্ত কাজ করছে। ঐ জমিতে একটি মসজিদ তৈরি করার পরিকল্পনা তাদের আছে। ঘটনার দিন, খেলা চলাকালীন মুসলমান ছেলেটি হিন্দু বিদ্বেষী কথা বললে, তাকে দু-চারটে চড় মেরে সতর্ক করা হয়। ছেলেটি তখন নিকটবর্তী কুমারহাট পি.ও. মসজিদে গিয়ে বিষয়টি জানালে সেখান থেকে প্রায় পাঁচশো মুসলমান ছেলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হিন্দু ছেলেদের ও প্রামাণিক পাড়া-সর্দার পাড়ায় হিন্দুদের শায়েস্তা করতে দলবেঁধে আসে। কিন্তু হিন্দু সংহতির কর্মীরা রুখে দাঁড়ায় এবং গ্রামের সাধারণ হিন্দু পুলিশে খবর দিলে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে। পুলিশের প্রচেষ্টায় দাঙ্গা বাঁধতে পারেনি। কিন্তু মুসলিমরা ফিরে যাওয়ার সময় দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়ে যায়।

এই হুমকি যে কত ভয়ঙ্কর ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ২২শে এপ্রিল যখন প্রায় দুহাজার মুসলমান অস্ত্র সহ হিন্দু গ্রাম আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু হিন্দুদের শক্ত প্রতিরোধের মুখে তারা কিছু করে উঠতে পারেনি।

এলাকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য ২৩ তারিখ বারুইপুর থানায় এক শান্তি বৈঠক ডাকা হয়। যদিও এই বৈঠকে হিন্দুরা উপস্থিত হলেও মুসলমানরা এই বৈঠকে যোগ দেয় নি। এলাকায় প্রবল উত্তেজনা রয়েছে। মুসলমানরা কিছু করতে না পেরে এলাকায় রটিয়ে বেরাচ্ছে পঞ্চায়েত ভোট মিটে গেলে তারা ঐ খাস জমি দখল করবে ও তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করবে।

বৈধ জমিতে বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিবাদ

আহতের সংখ্যা দশের অধিক

হাওড়া জেলার বাগনান থানার অন্তর্গত কাটাপুকুর গ্রামে বলরামপুর মৌজার সংযোগস্থলে শ্মশানসহ ষোলআনার একটি সম্পত্তি আছে। জায়গাটি যাতে বেদখল হয়ে না যায় সেই কারণে গত ২রা জুন দুপুরবেলা অঞ্চলের স্ত্রী-পুরুষ সকলে জায়গাটিতে বেড়া দেওয়ার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়। সেই সময়ে হঠাৎ সেখ মান্নান আলি, শেখ মর্তাজ আলি (উভয়ের পিতা হাসান আলি), মিলন শা (পিতা সেখ সওকত আলি), সেখ জুম্মান (পিতা কুবেন), সেখ আনোয়ার (পিতা সেখ জয়নাল), মাধু শা, কোহিনূর খাতুরন, সেখ রাজু, শুকুর শা, সেখ তারু, সেখ জয়নাল, বাবলু শা, সেখ বাপি, আসগার শা সহ প্রায় শতাধিক মুসলমান (এদের প্রত্যেকের ঠিকানা কাঁটাপুকুর গ্রাম, বাগনান থানা) অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হিন্দুদের আক্রমণ করে। তাদের হাতে লাঠি, তলোয়ার, লোহার রড, অ্যাসিড, লঙ্কার জল, ইট ছিল। মুসলিমরা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে ও হিন্দুদের বেড়া দেওয়ার কাজে বাধা দেয়। যেটুকু বেড়া দেওয়া হয়েছিল সেটুকুও তারা ভেঙে দেয়। হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হলে উপস্থিত মুসলমান দুষ্কৃতিদের মধ্যে সেখ মান্নান আলি, সেখ আনোয়ার, সেখ তরু অন্যান্যদের নির্দেশ দেয় যে, শালাদের একেবারে জানে খতম করে দে। এর পরই মুসলমানরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মানিকলাল জানা, শ্যামলী জানা, সৌমিত্র জানা, গোপাল ধাড়া, সীমা ধাড়া, লক্ষ্মী জানা, ভীষ্ম দাস, সন্তোষ খাঁড়া গুরুতর জখম হয়। এছাড়া অনেকেই কম বেশি মুসলমানদের আক্রমণে আহত হয়েছে। লক্ষ্মী জানা ও সীমা ধাড়ার শ্লীলতাহানি করে মুসলিম দুষ্কৃতিরা। যাওয়ার আগে মুসলিম দুর্বৃত্তরা হুমকি দিয়ে যায় যে আবার বেড়া দেওয়ার চেষ্টা করলে এলাকায় তারা রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে।

এই আক্রমণের প্রতিবাদে স্থানীয় হিন্দুরা বাগনান থানায় একটি ডাইরি করে (ডাইরি নং ৯৮/১৩, ২-৬-১৩)। জখম ব্যক্তিদের বাগনান হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করা হয়। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদেরকে উলুবেড়িয়া হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে এখনও কয়েকজন চিকিৎসাধীন। পুলিশের উচ্চমহলে বিষয়টি জানানো হয়েছে। পুলিশ দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে কত দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেয়, এখন সেটাই দেখার।

লালসার শিকার আট বছরের নাবালিকা

কলকাতার উপকণ্ঠে কসবা থানার অন্তর্গত ১৬৯৭, রাজডাঙ্গা মেন রোডের সি.এম.ডি.এ., প্লট নং এম.আই.জি. ১১৩/৮৯, কলকাতা ১০৭-এর একটি নির্মীয়মান চারতলা বাড়ির কেয়ারটেকারের কাজ করে অমর সর্দার। ঐ বাড়ির একতলায় অমরবাবু তার স্ত্রী ও চার ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে। গত ৭ই মে অমর সর্দার ও গঙ্গা সর্দারের ৮ বছরে নাবালিকা মেয়ে সোনালি সর্দারকে ধর্ষণের শিকার হতে হল।

ঘটনার দিন সকাল ১০টা নাগাদ গঙ্গাদেবী কাজ থেকে ফিরে রান্না করছিলেন। ছোট ছেলে অনুভবকে দেখতে না পেয়ে মেয়ে সোনালিকে তাকে খুঁজতে বলে। খুঁজতে খুঁজতে সোনালি বাড়ির ছাদে আসে, যেখানে চারজন রঙের মিস্ত্রি কাজ করছিল। তারা জানায় যে অনুভব নীচে গেছে। সোনালি নীচে নেমে এলে ঐ রঙের মিস্ত্রিদের একজন মুসারফ শেখ (৩৪), বাবা আয়ুব আলি শেখ তার পিছনে নেমে আসে এবং তিনতলার একটি ফাঁকা ঘরে সোনালিকে ঢুকিয়ে দেয়। তারপর আপন যৌন লালসা তৃপ্ত করতে সোনালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসারফ। ৮ বছরের সোনালি নিজেকে বাঁচাতে মুসারফের মুখে গায়ে ঘুষি মারতে থাকে। কিন্তু নিজেকে মুসারফের হাত থেকে বাঁচাতে না পেরে সে তার দাড়ি ধরে টানে। তখন মুসারফ সোনালিকে ছেড়ে দিলে তার হাত থেকে কোনমতে ছাড়িয়ে সোনালি নীচে নেমে এসে মা'কে ঘটনাটা বলে। তখন গঙ্গাদেবী চিৎকার করে আশেপাশে লোকজন জড়ো করে মুসারফের কুকীর্তির কথা তাদের জানায়। তখন মুসারফ পালানোর চেষ্টা করলে এলাকাবাসীরা তাকে ধরে ফেলে। তারপর তাকে বেদম মার দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। জিয়ারুল শেখ নামক আরও এক মিস্ত্রি এই অন্যায় কাজে মুসারফকে সাহায্য করেছিল। পুলিশ পরে জিয়ারুল শেখকেও গ্রেপ্তার করেছে।

ধীরে ধীরে মুসলমানদের কবলে চলে যাচ্ছে

হিন্দুদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র গঙ্গাসাগর

গঙ্গাসাগর মেলা হিন্দুদের এক পবিত্র তীর্থ উৎসব। কথায় বলে যে 'সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার'। যে মেলাকে কেন্দ্র করে মকর সংক্রান্তির দিন সারা ভারত, এমনকি ভারতের বাইরে থেকেও লক্ষ লক্ষ হিন্দু তীর্থযাত্রী পুণ্যস্নানের জন্য এখানে আসেন। একমাত্র কুম্ভ মেলা ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও কোনো ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে এত লোকের সমাবেশ হয় না। সরকারী ব্যবস্থায় মেলা সাজিয়ে তোলা হয়, গড়ে তোলা হয় অস্থায়ী যাত্রীনিবাস। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলোর ব্যবস্থায় প্রায় সাতদিন ধরে চলে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ। শুধু তাই নয় এই সময় একটা বড় ব্যবসায়ীক অঞ্চলে পরিণত হয় গঙ্গাসাগর। অনেক মানুষের সারা বছরের জীবিকা চলে এই সময়ে করা উপার্জিত অর্থে। পুণ্যতীর্থ গঙ্গাসাগর মেলা শেষ হওয়ার কয়েকমাস পর যখন হিন্দু সংহতির কর্মীরা গঙ্গাসাগরে যায়, গিয়ে কয়েকটি অদ্ভুত দৃশ্য তাদেরকে হতবাক করে দেয়। প্রথমতঃ মেলা প্রাঙ্গণে ঢোকার মুখে ৫ নং রাস্তার মুখে দেখা যায় পুরো রাস্তা জুড়ে মুসলমান মজলিসের জলসার গেট। স্থানীয় মানুষের কথা অনুযায়ী কুড়ি দিন আগে ইসলামিক জলসাটি শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু গেটটি তারা খোলেনি। এই না খোলার কারণ হল অঞ্চলে বর্তমানে মুসলিমদের আধিপত্য বিস্তার হয়েছে তা প্রমাণ করা। গঙ্গাসাগর হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান হতে পারে কিন্তু এলাকাটি পুরোপুরি মুসলমানদের দখলে চলে গেছে। হয়ত এমন দিন আসবে যেদিন হিন্দুদের পবিত্র মকর সংক্রান্তির উৎসবকে কেন্দ্র করে পুণ্যস্নান উৎসব বন্ধ হয়ে যাবে।

নির্মীয়মান জলসার তোরণ। গঙ্গাসাগর।

ইয়াকুব মল্লিকদের মতো মুসলিমদের নেতৃত্বে আশ্চর্যজনকভাবে ৫ নং বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে পশ্চিম দিকে হেলিপ্যাড অঞ্চল পর্যন্ত রাস্তার দুদিকে মুসলিম বস্তি বা কলোনি গজিয়ে উঠেছে। এছাড়াও সাগর থানার মেলার পুলিশ ফাঁড়ির সামনে 'হঠাৎ কলোনী' নামে একটি ভয়ঙ্কর মুসলিম বস্তি গজিয়ে উঠেছে। এই কলোরী অধিকাংশ মুসলমানই দুষ্কৃতি ও অসামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি এদের পেশা। এরা সবাই ধোলা, ঘোরমরা, মৌসুমি দ্বীপের অধিবাসী। এদের দাপটে মাঝেমধ্যে তীর্থযাত্রীদের হার ছিনতাই ও শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটছে। এই কলোনী গুলোতে যেসব মুসলমানেরা বসবাস করে তাদের কারোরই ভারতীয় নাগরিকত্বের বৈধ কাগজ নেই। এ সমস্ত ঘটনা প্রশাসন বা রাজনৈতিক দলগুলির অজানা নয়। তবু তাদের ত রফ থেকে এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

গঙ্গাসাগরে গজিয়ে ওঠা এই সেই হঠাৎ কলোনী

মুসলমানদের অশালীন আচরণে ভেস্তে গেল পূজা উপলক্ষে সামাজিক অনুষ্ঠান

বাগনান থানার সাবসিট অঞ্চলের গাদিপাত্র পাড়ায় গত ২৫শে মে কালীপূজা হয়। পূজা উপলক্ষে ২৬শে মে সন্ধ্যায় অঞ্চলের অধিবাসীরা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠান শুরুর সময় পাশের অঞ্চলের মুসলমানরা এসে ঝামেলা শুরু করে। লাইট ভেঙে দেয় ও মেয়েদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করে। এলাকার হিন্দুরা এই ঘটনার প্রতিবাদ করে এবং সমস্ত দুষ্কৃতিদের মেরে তাড়িয়ে দেয়। পরদিন ২৭শে মে হিন্দুরা সাবসিট বাজারে গেলে মুসলমানরা তাদের মারধোর করে। দুজনের মাথা ফাটিয়ে দেয়। এই ঘটনার পর বাগনান থানায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি ডাইরি করা হয়। পরে অঞ্চলের নেতারা এসে ব্যাপারটা মিটমাট করে দেয়।

কাকদ্বীপে হিন্দু ব্যবসায়ীর উপর হামলা

কথায় বলে 'দুর্জনের ছলের অভাব হয় না' তারই নজির দেখা গেল কাকদ্বীপের উকিলের বাজারে এক মুদিখানার দোকানে। গত ২৭শে মে শেখ মুরশেদ ও তার দলবল নিয়ে প্রণয় দত্তের দোকানে যায় কিছু মাল কেনার নাম করে। দোকানদারকে বিরক্ত করার জন্য ৫০০ গ্রাম সরষের তেলের প্যাকেটের দাম কত জিজ্ঞাসা করে দোকানদার যথারীতি উপযুক্ত দাম বলে কিন্তু মুরশেদ বলে প্যাকেটে ৪৫০ গ্রাম ওজন লেখা আছে কিন্তু সে ৫০০ গ্রামের দাম কেন নিচ্ছে? তখন ষাট উর্দ্ধের প্রণয়বাবু বলেন এটা কোম্পানীর ব্যাপার তারা যে ভাবে দাম ঠিক করেছে আমরা সে ভাবে দাম নিচ্ছি, তোমার যদি কোনও আপত্তি থাকে তাহলে কোম্পানীকে বল। আর যদি অন্য কোনও অসুবিধা থাকে তাহলে আমার দোকান থেকে মাল নিতে হবে না। আমি ঐ দামের কম নিতে পারব না। তখন মুরশেদ প্রণয়বাবুকে সজোরে থাপ্পড় মারলে উনি মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে যান। তারপর দোকানের এক কর্মচারী এই ব্যাপারে প্রতিবাদ করলে তার উপর মুরশেদ তার দলবল নিয়ে চড়াও হয় ও দোকান লণ্ডভণ্ড করে চলে যায়। যাওয়ার আগে হুমকি দিয়ে যায় তারা যে ভাবে বলবে শুনতে হবে, না হলে তাদের কপালে দুঃখ আছে। এই ঘটনায় তারা পুলিশের কাছে যেতে ভয় পায়।

রসুইগ্রামে আদিবাসী যুবককে মারধোর প্রতিবাদে সামিল হল না প্রশাসন

উত্তর ২৪ পরগণার চাতড়া পঞ্চায়েতের বাদুড়িয়ার থানার অন্তর্গত রসুইগ্রামে হালিম মন্ডল নামক এক ব্যাক্তির আমবাগান আছে। সেই আমবাগানের পাহারার কাজ করে উৎপল সর্দার (পিতা লক্ষ্মণ সর্দার) নামে ২০ বছরের এক আদিবাসী যুবক। এই সময় স্থানীয় কিছু মুসলমান যুবক তাদের শস্যক্ষেত্র নষ্ট হচ্ছে বলে উৎপলকে বেদম প্রহার করে। যদিও এর সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই তাকে মারধোর করা হয় বলে এলাকাবাসীর ধারণা। প্রচণ্ড মার খেয়ে উৎপল অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

লক্ষ্মণ সর্দার তাদের আদিবাসী পাড়ায় ঘটনাটি জানালে তারা দলবল নিয়ে রসুইগ্রামে হাজির হয় এবং বেশ কিছু লোককে মারধোর করে। এতে মুসলমানরা থানায় ডাইরি করলে পুলিশ এসে তাদের ধরে নিয়ে যায়। মুসলমানরা ক্ষতিপূরণ বাবদ কয়েক হাজার টাকার এদের কাছে দাবি করেছে। প্রশাসন এই গরিব আদিবাসীদের ৭০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে। এরা রাজনৈতিক নেতাদের কাছে গেলে কোন দলই এদের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। স্বপন মন্ডল, বুম্বা, সরজিৎ ঘোষ, জয় মুরাই সর্দার-এর নামে কেস দায়ের করা হয়েছে। মুসলমান তোষণের এক নমুনা দেখা গেল রসুই-এর ঘটনায়।

নোয়াখালিতে মৌলবাদীদের হাতে আক্রান্ত হিন্দু পরিবার

বাংলাদেশে মৌলবাদী মুসলমানদের অত্যাচার দিন দিন বেড়েই চলেছে। সরকার-প্রশাসনের কাছে জানিয়েও সংখ্যালঘু হিন্দুরা কোন সুবিচার পাচ্ছে না। এরকম আতঙ্কের মধ্যেই তাদের দিন কাটাতে হচ্ছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের নোয়াখালিতে মৌলবাদী জামাত দুর্বৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত হল এক হিন্দু পরিবার। রাতের অন্ধকারে দুর্বৃত্তরা পরিবারটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের আক্রমণ থেকে দুধের শিশুও বাদ যায়নি। তাকেও চপার দিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনা এলাকার সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। প্রশাসনের আশ্বাস সত্ত্বেও গ্রামগুলো ধীরে ধীরে হিন্দু শূন্য হয়ে পড়ছে। কারণ প্রশাসনের মৌখিক আশ্বাসে তাদের আর বিশ্বাস নেই।

নোয়াখালিতে জামাত দুর্বৃত্তদের দ্বারা নিহত শিশু

বর্তমানে বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে হিন্দুদের অবস্থা শোচনীয়। তাদের জীবন ও সম্পত্তির কোন নিরাপত্তা নেই। প্রশাসনের কাছে এ বিষয়ে জানালেও তারা চোখ বন্ধ করে রয়েছে। মানবাধিকার কমিশনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ইসলামিক অত্যাচার বেড়েই চলেছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামীদিনে বাংলাদেশে হিন্দুদের ভবিষ্যত কি তা সহজেই অনুমেয়।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.com>, <southbengalherald.blogspot.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Pargans,
Editor's Name & Address : Bikarna Naskar, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012